

শাইখ টিম হাস্বেলের ‘The Methodology of Prophets in Dawah’ অবলম্বনে

নবিদের দাওয়াতি পদ্ধতি

ভাষান্তর : আরিফুল ইসলাম



গাউয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

দাওয়াতের গুরুত্ব	১১
দাওয়াত না দেওয়ার পরিণাম	১৬
নবি-রাসূলগণের প্রথম আহ্বান	১৮
নুহ (আ.)-এর দাওয়াত	২২
ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াত	২৯
মুসা (আ.)-এর দাওয়াত	৩৪
ঈসা (আ.)-এর দাওয়াত	৩৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত	৪২
নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর জ্ঞান	৪৮
প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত	৫০
সুন্দরতম পন্থায় বিতর্ক	৫৩
উপহার বিনিময়	৫৭
রাজা-বাদশাহদের প্রতি নবীজির চিঠি	৫৯
মুয়াজ ইবনে জাবালকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপদেশ	৬৬
সাহাবিদের দাওয়াতের পদ্ধতি	৭০
একজন দাঈর গুণাবলি	৮৬
আমরা দাঈ, বিচারক নই	৮০
নিঃস্বার্থ দাওয়াত	৮৩
শেষ কথা	৮৫

দাওয়াতের গুরুত্ব

মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া হলো সর্বোত্তম একটি আমল। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে সওয়াব প্রত্যাশা করি, আজাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহর প্রিয় নবি-রাসূলগণ এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন, কীভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

নবি-রাসূলগণের শেখানো পদ্ধতিতে আমাদেরও দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর আর কোনো নবি-রাসূল আসবেন না। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু দাওয়াতের ধারা শেষ হয়নি। এখন দাওয়াতের দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মতের ওপর। প্রত্যেক মুসলিম একেকজন দ্বীনের দাঈ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাহ তথা আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ-

‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের মানবজাতির জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।’ সূরা আলে ইমরান : ১১০

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাহকে ‘সর্বোত্তম’ উম্মাহ বলে অভিহিত করেছেন এবং কেন ‘সর্বোত্তম’, তা-ও উল্লেখ করেছেন। আর সেই কারণ হলো—ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, খারাপ কাজের নিষেধ করা। দাওয়াতের মূলকথা এটাই। ভালোর প্রতি আহ্বান, খারাপ থেকে নিষেধ।

দাওয়াতের দায়িত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করেছেন নবি-রাসূলগণ। আমরা যদি ভালো ‘দাঈ’ হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে তাঁদের দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আগে ভালোভাবে জানতে হবে। মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে আমরা অনেকেই ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করি। ফলে দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। নবি-রাসূলগণ কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে আমাদের জানা থাকলে এই ভুলগুলো এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدُهِمْ أَقْتَدِهٖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى
لِّلْعٰلَمِيْنَ-

‘তাদের আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন, অতএব আপনি তাঁদের পথই অনুসরণ করুন।’ সূরা
আনআম : ৯০

এই আয়াতের আগে আল্লাহ ১৮ জন নবি-রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেছেন—‘তাদের আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। অতএব, আপনি তাঁদের পথই অনুসরণ করুন।’ তাহলে দেখা যাচ্ছে—আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পূর্ববর্তী নবিগণের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন। একই নির্দেশ আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। আমরা যে পথে হাঁটতে যাচ্ছি, সেই পথের পূর্বসূরিদের অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। আর সে পথের পূর্বসূরি হলেন আল্লাহর মনোনীত নবি-রাসূলগণ।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নবি-রাসূলগণের দাওয়াতের কথা সাধারণ এবং বিশেষ; দুভাবেই উল্লেখ করেছেন। তিনি সাধারণভাবে বলেছেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا-

‘আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।’ সূরা নাহল : ৩৬

আবার বিশেষভাবে কয়েকজন নবি-রাসূলের দাওয়াতের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনে। কুরআনের অনেকগুলো সূরা আছে নবি-রাসূলগণের নামে। সেসব সূরায় আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে তাঁদের দাওয়াতের ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সূরাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—সূরা নুহ, সূরা হুদ, সূরা লুত, সূরা ইউসুফ, সূরা কাসাস, সূরা আশিয়া, সূরা ইবরাহিম, সূরা ইউনুস, সূরা মুহাম্মাদ।

নবিদের জীবন থেকে আমরা শিখব—দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি কোনটি, দাওয়াতের উপযুক্ত সময় ও জায়গা কীভাবে বাছাই করতে হয়। ধরুন, আপনি রাত তিনটার সময় একজন মানুষের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন—‘আমি দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছি’, তাহলে কি ব্যাপারটা হাস্যকর হবে না? আবার ধরুন, একজন মানুষ খুব ব্যস্ত। কোনো একটা জরুরি কাজে যাচ্ছে। এমন সময় আপনি তার পথ আটকিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। এতে কি হিতে বিপরীত হয়ে যাবে না?

এ ছাড়াও মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে গেলে আপনার প্রয়োজন অগাধ জ্ঞান। স্বল্প জানাশোনা নিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিতে গেলে বড়ো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আপনার আহ্বানে মানুষ দ্বীন সম্পর্কে ভুল বার্তা পেলে দাওয়াত কাজে আসবে না। মানুষ দ্বীনে প্রবেশ করার পরিবর্তে দ্বীনের

ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করবে। এজন্য দাওয়াতের পূর্বশর্ত হলো—‘জ্ঞান’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘আমার পক্ষ থেকে একটা আয়াত হলেও তোমরা সেটা পৌঁছে দাও।’^১

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের কথা বলেছেন। তবে ইসলামের কোনো ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েই আপনি তা মানুষের কাছে পৌঁছাবেন। না জেনে ভুল বার্তা কিছুতেই প্রচার করতে পারবেন না।

দাওয়াতের ময়দানে নামার আগে আপনাকে ধৈর্যধারণ করা শিখতে হবে। পৃথিবীতে যত নবি-রাসূল দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে মানুষ অবজ্ঞা করেছে, অবহেলা করেছে, অস্বীকার করেছে। আপনিও যদি দ্বীনের দাওয়াত দিতে যান, একই প্রতিক্রিয়া আসবে। মানুষ সাধারণত প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে পারে না। আপনার যদি ধৈর্যধারণের অনুশীলন না থাকে, তাহলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আপনি হতাশ হয়ে পড়বেন, ভেঙে পড়বেন, প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করবেন। দাঁষ্ট হতে হলে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই।

ওহি নাজিলের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার সময়ের মক্কার একজন ধর্ম বিশেষজ্ঞ। ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন—‘আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’ ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বললেন—‘তুমি যা নিয়ে এসেছ, অনুরূপ (ওহি) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে।’^২

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের সূচনালগ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। এতদিন যারা তাঁকে সত্যবাদী হিসেবে জেনেছে, তারাও তাঁর বিরোধিতা করবে। ওয়ারাকার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত হলেন—এক কঠিন বৈরী সময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। দাওয়াতের ময়দানে নামার সময় আমাদেরও প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর দাওয়াত দেওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এই ২০ বছর তাঁকে ধৈর্য ধরে দাওয়াত দিতে হয়েছে; এমনকী জন্মভূমিও ছাড়তে হয়েছে।

^১ বুখারি : ৩৪৬১

^২ বুখারি : ৩

নবি-রাসূলগণের প্রথম আহ্বান

নবি-রাসূলগণ বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান বিষয়বস্তু ছিল এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক নবিই তাঁদের নিজ নিজ জাতির কাছে একটি বিষয়েরই দাওয়াত দিয়েছেন, আর তা হলো তাওহিদ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ-

‘আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো।’ সূরা নাহল : ৩৬

প্রত্যেক নবিই মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাগুত বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। নুহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ-

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।’ সূরা আ’রাফ : ৫৯

হুদ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ-

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।’ সূরা আ’রাফ : ৬৫

সালিহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ-

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।’ সূরা আ’রাফ : ৭৩

শোয়াইব (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ-

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।’ সূরা আ’রাফ : ৮৫

প্রত্যেক নবি-রাসূল মৌলিকভাবে একই কথার দাওয়াত দিয়েছেন। আর সেটা হলো—আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। প্রত্যেক নবি-রাসূলের ধর্ম ছিল একটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘নবিগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম এক।’^৩

প্রত্যেক নবি-রাসূলের দাওয়াতের প্রথম কথা ছিল—‘এক আল্লাহর ইবাদত করবে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো কাফিরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, তখন তাওহিদের দাওয়াত দিতেন। মৃত্যুর বিছানায় তাঁর চাচা আবু তালিবকে দ্বীনের যে বিষয়টি মেনে নিতে অনুরোধ করেছিলেন, সেটাও ছিল আল্লাহর একত্ববাদ। আবু জাহেলকে বলেছিলেন তাঁর একটি কথা মেনে নিতে। জবাবে আবু জাহেল বলেছিল—‘একটি কেন, দশটি কথা মানব। বলো, কী কথা?’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওহিদের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু আবু জাহেল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল।

অনেকেই অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার সময় তাওহিদ ছাড়া ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দেন। ইসলামের সৌন্দর্য উল্লেখ করতে গিয়ে এসব বিষয়ের দাওয়াত দেওয়া ভুল কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুজিজার কথা উল্লেখ করতেই পারেন, কিন্তু দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু সেগুলো নয়; দাওয়াতের মূল বিষয় হলো তাওহিদ।

অনেকেই অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বই লিখেন, কনফারেন্সের আয়োজন করেন। সেসব বইয়ের পাঠক কিংবা কনফারেন্সের শ্রোতা কোনো অমুসলিমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—‘কী শিখলেন?’ তারা জবাব দেয়— ‘কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময়, অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের অধিকার, ইসলামে মানবাধিকার, ইসলামে পরিবেশ অধিকার ইত্যাদি।’ কিন্তু তারা তাওহিদের শিক্ষা পায় না। অথচ অমুসলিমরাও মানুষের সেবা করে, সমাজের উপকার করে, অন্যের বিপদে এগিয়ে যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের কাছে দাওয়াত দিতে গেলে তাওহিদের দাওয়াতই দিতে হবে।

ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াত

ইবরাহিম (আ.) হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর শ্রেষ্ঠ নবি। পবিত্র কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরা আছে—সূরা ইবরাহিম। তাঁর জীবন থেকে দাওয়াতের অনেকগুলো শিক্ষণীয় পদ্ধতি আছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أُرِأَيْتَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

‘স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম তাঁর পিতা আজরকে বলল, তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছ? নিশ্চয়ই আমি তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট গোমরাহিতে দেখছি।’ সূরা আনআম : ৭৪

ইবরাহিম (আ.) গিয়ে তাঁর বাবাকে তাওহিদের দাওয়াত দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি আল্লাহর ইবাদত না করে মূর্তিগুলোর ইবাদত করছেন? অথচ মূর্তিগুলো তাঁর নিজের হাতের তৈরি। তিনি নিজ হাতে যে মূর্তি বানাচ্ছেন, সেই মূর্তির আবার ইবাদত করছেন। এটা কীভাবে সম্ভব!

আরেকবার ইবরাহিম (আ.) বিতর্ক করলেন সূর্যপূজারীদের সাথে। আকাশের সূর্য দেখে বললেন—‘এটাই আমার রব।’ কিন্তু যখন এটা অস্তমিত হলো, তখন যুক্তি দেখালেন—‘অস্তগামীদের আমি ভালোবাসি না।’ অর্থাৎ, সূর্য যদি আমার রব হতো, সেটা তো অস্ত যেত না। আকাশে উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ দেখে বলে উঠলেন—‘এটাই আমার রব।’ কিন্তু চাঁদও অস্ত গেলে পালটা যুক্তি দেখালেন। এই ঘটনা কুরআন বর্ণনা করেছে—

فَلَمَّا رَأَى الشُّشُوسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْقِمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ-

‘অতঃপর সূর্য উঠলে তিনি বললেন—“এটা তো বড়ো (আগেরগুলোর চেয়ে)। এটাই আমার রব।” সন্ধ্যার সময় সূর্য অস্ত গেলে তিনি আবার যুক্তি দেখালেন।’ সূরা আনআম : ৭৮

নক্ষত্রপূজারীদের সাথে বিতর্কের সময় ইবরাহিম (আ.) ‘এটাই আমার রব’ বলে নিজের সংশয় প্রকাশ করেননি; বরং তাঁর কথার মাধ্যমে সূর্যপূজারি ও চন্দ্রপূজারিদের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। অতঃপর সেই যুক্তির পালটা যুক্তি হাজির করে তাদের চিন্তার অসারতা প্রমাণ করেছিলেন।

কোনো কিছু আমাদের চেয়ে বড়ো, সুন্দর মানেই সেটি আমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। অনেকেই এই কারণে তাদের আশেপাশের সবকিছুকে তাদের সৃষ্টিকর্তা মনে করে। ইবরাহিম (আ.) তাদের সাথে বিতর্ক করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সেগুলো আমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়; সেগুলোরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।

তাহলে কার ইবাদত করতে হবে? ইবরাহিম (আ.) ‘কার ইবাদত করা যাবে না’ যেমন বলেছেন, তেমনি বলেছেন—তিনি কার ইবাদত করেন, তা-ও। কুরআনে বলা হয়েছে—

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

‘আমি একনিষ্ঠ হয়ে সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফেরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।’ সূরা আনআম : ৭৯

ইবরাহিম (আ.) মূর্তিপূজারীদের অভিশাপ দেননি, তাদের অবজ্ঞা করেননি। তিনি বরং যুক্তির সাথে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন এবং মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ-

‘আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিয়ো না; তাহলে তারা অজ্ঞতাবশত অন্যায়ভাবে আল্লাহকেও গালি দেবে।’ সূরা আনআম : ১০৮

আল্লাহর গুণাবলি পূর্ণাঙ্গ। তাঁর গুণাবলির মধ্যে কোনো খুঁত নেই। কিন্তু মানুষ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদের সৃষ্টিকর্তা মনে করে, তাদের মধ্যে খুঁত খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যেমনটা ইবরাহিম (আ.) পেয়েছিলেন। একদিন ইবরাহিম (আ.) তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করলেন—‘এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজা করছ?’ তারা কোনো যৌক্তিক জবাব না দিয়ে শুধু বলল—‘আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এসবের পূজা করতে দেখে এসেছি।’

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ-

‘তখন ইবরাহিম বললেন—তোমরা নিজেরা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও।’ সূরা আশ্বিয়া : ৫২-৫৪

অধিকাংশ মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের কাজকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। কাজটি ঠিক নাকি ভুল, যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক; সেটার তোয়াক্কা করার প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। এমন মানসিকতা প্রায় সকল যুগের মানুষের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। যখনই মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, তখনই তারা এই অজুহাত দেখিয়েছে— ‘আমাদের বাপ-দাদা তো এটা করেননি।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাসূল, নবি-রাসূলগণের ইমাম, শেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসূল আসবেন না। নবুয়তের ধারা তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন—

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنِ اتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ-

‘বলুন, আমি তো নতুন কোনো রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। আমার কাছে যে ওহি পাঠানো হয়, আমি শুধু তা-ই মেনে চলি। একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আমি আর কিছু নই।’ সূরা আহকাফ : ৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের জানিয়ে দিলেন, তিনি নতুন কোনো বার্তা নিয়ে আসেননি। তিনিই একমাত্র বা প্রথম রাসূল নন; বরং তাঁর পূর্বেও আল্লাহ তায়ালা অনেক নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি সেই ধারার একজন রাসূল। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ যে মৌলিক বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে এসেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও একই বার্তা নিয়ে এসেছেন। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের পথ ও তাঁর পথ একই পথ। তাঁর পূর্বে যারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের বার্তার সাথে তাঁর বার্তার মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেক নবি-রাসূলকে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন তাঁর একত্ববাদের জানান দিতে।

রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেই আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন তাঁর নিকটাত্মীয়কে আগে দাওয়াত দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ-

‘তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দাও।’ সূরা শুআরা : ২১৪

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহ্বান করে বললেন—‘হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আত্মরক্ষা করো। আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না।’^৪

অতঃপর তিনি নাম ধরে ধরে তাঁর নিকটাত্মীয়দের সম্বোধন করতে লাগলেন। তাঁর ফুফু এমনকী তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কেও আল্লাহর আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এ থেকে বোঝা যায়—দাওয়াতের প্রথম হকদার হলো নিকটাত্মীয়রা। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতে সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন তাঁর ঘনিষ্ঠজন।

আমরা দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই এই ভুলটি করি। নিজের পরিবারকে দাওয়াত না দিয়ে সারা বিশ্বে দাওয়াত দিয়ে বেড়াই। নবি-রাসূল ও সাহাবিদের জীবনী পড়লে তার উলটো ঘটনা দেখা যায়। তারা সর্বপ্রথম নিজের পরিবারে দাওয়াত দিয়েছেন, অতঃপর বাইরের মানুষকে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—‘Charity begins at home।’ অর্থাৎ, ‘আগে ঘর, তবে তো পর।’ দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা বাইরে যেমন দাওয়াত দেবো, নিজের ঘরেও তেমনি দাওয়াত দেবো। দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের ঘরকে আগে প্রাধান্য দেবো। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।’ সূরা আত-তাহরিম : ৬

দাওয়াত দিতে গেলে ধৈর্যধারণ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী পড়লে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মক্কায় ১৩ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মদিনায় গিয়েছেন। মক্কার মানুষ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ না করলেও মদিনার মানুষ ঠিকই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে। চারিদিক থেকে যখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল, তখন ওই দূরের মদিনার মানুষই তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

হজের সময় মদিনার লোকেরা হজ করতে মক্কায় এলে রাসূল (সা.) তাদের দাওয়াত দিলেন। সেই দাওয়াতের ফলে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল এবং মদিনায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগল। মদিনাকে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বেই উপযুক্ত করে গড়ে তুলল। তাঁর আগমনের পূর্বেই মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় মাত্র গুটিকয়েক মানুষজনকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মদিনার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দাওয়াতি কাজ করেছিলেন মক্কায়। মক্কায় দাওয়াত দেওয়ার সময় তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই ধৈর্যের ফল পেলেন মদিনায়।

প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ-

‘তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন—কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন।’ সূরা নাহল : ১২৫

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দাওয়াতের তিনটি মৌলিক পদ্ধতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো হলো—

- প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত।
- সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত।
- সুন্দরভাবে বিতর্ক করা।

প্রত্যেক নবি-রাসূলের মধ্যে দাওয়াতের এই তিনটি উপাদান খুঁজে পাবেন। তাঁরা মানুষকে প্রজ্ঞার মাধ্যমে আহ্বান করেছেন, উত্তমরূপে উপদেশ দিয়েছেন এবং যৌক্তিকভাবে, সুন্দরতম উপায়ে বিতর্ক করেছেন। আলিমগণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে ‘হিকমাহ’ বা ‘প্রজ্ঞা’ শব্দের ব্যবহারের তিনটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো—

- দাওয়াত প্রদানের বিষয়।
- দাওয়াত উপস্থাপনের ভঙ্গি।
- দাঈর চরিত্র।

আপনার দাওয়াত উপস্থাপনের ভঙ্গি হতে হবে কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত কোনো বিষয়ে আপনি দাওয়াত দেবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মনগড়া কোনো কথা বলতেন না। তিনি দ্বীনি বিষয়ে যেসব কথা বলতেন, সেসব আল্লাহর ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত; তাঁর বানানো কোনো কথা নয়।

আপনি মানুষকে এমন ভাষায় দাওয়াত দেবেন, যেন তারা সহজে বুঝতে পারে। আপনি চীনে গিয়ে বাংলা ভাষায় দাওয়াত দিলে কাজ হবে না। আপনাকে তাদের ভাষা জানতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাষা না জেনে কিংবা সাথে কোনো দোভাষী না রেখে আপনি দাওয়াত দিতে পারবেন না। একেক শ্রেণির মানুষের জন্য দাওয়াতের একেক ভাষা, একেক রকম সম্বোধন রয়েছে। আপনি গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষদের তাদের ভাষায় সহজভাবে দাওয়াত উপস্থাপন করবেন। কিন্তু একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাষায় দাওয়াত দিলে তা ফলপ্রসূ হবে না। তার সঙ্গে তার ভাষায় কথা বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর কাছে চিঠি প্রেরণ করেতেন, তখন তাদের সম্মানের সাথে সম্বোধন করতেন। তাদের নামের সঙ্গে থাকা উপাধি ব্যবহার করতেন।

দাঈর আরেকটি গুণ হলো—মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা। উগ্রতা প্রদর্শন করে দাওয়াত দেওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের পদ্ধতি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ-

‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।’ সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

দাওয়াতের হিকমাহ হলো—আপনি নম্রভাবে দাওয়াত দেবেন। আবার কখনো প্রয়োজনে কঠোর হবেন; এটাও হিকমাহ। যে পরিস্থিতিতে যেভাবে আচরণ করতে হয়, সেই পরিস্থিতিতে সেভাবে আচরণ করার নামই হলো হিকমাহ।

একজন দাঈর চরিত্র সমাজের আর দশজনের মতো হলে হবে না। তাকে চারিত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। তার মধ্যে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরাক্ষতার মতো গুণাবলির সমন্বয় থাকতে হবে। এ ছাড়াও থাকতে হবে হিকমাহ। ইমাম আশ-শাওকানি (রহ.) বলেন— ‘হিকমাহ হলো একজন মানুষের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ গুণাবলি।’ অর্থাৎ, একজন মানুষ বোকার মতো কাজ করবে না। একজন মানুষ শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয় না, তেমনি একজন দাঈও বোকার মতো কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। তিনি মানুষকে উত্তম উপদেশ দেবেন।

একজন দাঈর গুণাবলি

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁকে সবাই চিনত। সবাই তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করত। তাঁকে ‘আস-সাদিক’ ও ‘আল-আমিন’ নামে ডাকত। একজন মানুষের মধ্যে যত ভালো গুণের সমন্বয় থাকতে পারে, তার সবটুকু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে ছিল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ-

‘নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।’ সূরা কালাম ৬৮ : ৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। যে মানুষ ৪০ বছর কোনো মিথ্যা কথা বলেননি, কারও সাথে প্রতারণা করেননি, গালাগালি করেননি; তাঁর আহ্বানকে বিবেকবান মানুষরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোমল আচরণের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ-

‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।’ সূরা আলে-ইমরান ৩ : ১৫৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য নবি-রাসূলের জীবনীর আলোকে বোঝা যায়— দাঈকে অবশ্যই চরিত্রবান হতে হবে। মানুষের মধ্যে যতগুলো মানবীয় গুণাবলি থাকে, একজন দাঈর চরিত্রে তার প্রত্যেকটির প্রতিফলন থাকা জরুরি। তবে শুধু সচ্চরিত্রই দাওয়াতের জন্য যথেষ্ট নয়। একজন দাঈকে জ্ঞানী হতে হবে। যে বিষয়ে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। আর যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নবির দাওয়াত সম্পর্কে বলেছেন—

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِأَلْوَحْيٍ-

‘বলো, আমি তো শুধু ওহি দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি।’ সূরা আশ্বিয়া : ৪৫

একজন দাঈ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেবেন। তিনি মনগড়া কথা বলবেন না। তার কথার সপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর পর্যাপ্ত দলিল থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتُّكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ-

‘আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে আল্লাহর নামে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হয় না।’ সূরা নাহল : ১১৬

একজন দাঈ যে বিষয়ের দাওয়াত দেবেন, তা আগে নিজেকে মানতে হবে। তিনি এমন কিছু দাওয়াত দেবেন না, যা তিনি নিজে মানেন না। এতে দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে না; বরং এর বিরূপ প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়বে। মানুষ তার দাওয়াত নিয়ে হাসাহাসি করবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

اتَّأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ-

‘তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ করছ এবং তোমরা নিজেদের সম্পর্কে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না?’ সূরা বাকারা : ৪৪

পবিত্র কুরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?’ সূরা সফ : ২

দাঈ তার দাওয়াতের অন্যথা করলে এই দাওয়াতই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে—“হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজের নিষেধ দিতে?” তখন সে বলবে—“হ্যাঁ, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদের অসৎকাজের নিষেধ করতাম, অথচ আমি নিজে তা-ই করতাম।”’^৫